শরীরী

কাবেরী রায়চৌধুরী

আমার গ্রামের ভারি সুন্দর একটা নাম ছিল জানো ? ধারাবারি। তখনও চব্বিশ পরগণা ভাগ হয়নি। সব মিলিয়ে বড় এক জায়গা। গাছপালা, নদী, পুকুর, সব নিয়ে যাকে বলে পাড়া গাঁ। বুঝলে ? তখন তোমরা কোথায় আর ? সেসব দিনের কথা তোমরা

ভাবতেই পারবে না। গ্রামে গেছ কখনও ?

ভুরু নাচালেন রমনীমোহন।

জবা একগাল হেসে বলল, আমার গ্রাম দেখা মানে, ওই সত্তর-বাহাত্তর সালে গৌরীপুর, বিরাটি ওই পর্যন্ত।

-- ধূর ! ওটা আবার গ্রাম হল ? শরৎ চাটুজ্যের বই পড়নি ? ওইরকম গ্রাম আমাদের। সে কি আজকের কথা ? আটত্রিশ সাল !

-- কেমন ছিল ?

-- ভারী সুন্দর। কোথায় তখন দুষণ ? দুষণের নামই শুনিনি। বেড়ে ছিলাম। পুকুরে সাঁতার কাটছি, পরের বাড়ির ফলপাকুড় চুরি করছি, মাথ-ঘাট-বাদা দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। আর কী চাই ?

রমনীমোহনের কথা এতক্ষণ হা করে শুনছিল জবা। মানসচক্ষে কল্পনা করার চেষ্টা করছিল, তৎকালীন গ্রামের প্রাচীন চেহারাটা।

-- কী ভাবছ ?

-- আমি ? ওহোঃ ! লজ্জা পেয়ে গেছে জবা। নিজের কোনও আবেগ সে প্রকাশ্যে জানাতে চায় না।

-- নিশ্চয়ই ভাবছিলে কিছু ? রমনীমোহন চশমাটি খুলে হাতে নিয়ে তার দীঘল চোখ দুটিতে এক অত্যাশ্চর্য ভাব ফুটিয়ে জবার চোখে স্থাপন করলেন।

অস্বস্তি লাগছে জবার। পরক্ষণেই সপ্রতিভ। বলল, আপনার বর্ণনা শুনে গ্রামটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। আসলে যা আমি দেখিনি, সেইসব ভাবতে, কল্পনা

করতে আমার দারুণ লাগে। এমন কত সময় হয় যে, চুপচাপ শুধু ভেবেই যাচ্ছি। বিশেষ করে হয়তো কোনও পার্টি বা গেট টুগেদারে গেছি, ভাল লাগছে না, কী করে জানেন ? ভাবতে বসে যাই। তারপর ধরুন লং ডিসট্যান্স জার্নিতে বেরিয়েছি, ভাবতে ভাবতেই দেখি গন্তব্য এসে গেছে। অবশ্য আমার কাছে গন্তব্য মানেটাই তো অন্যরকম।

-- কেমন ? বুঝলুম না।

-- শুনলে হাসবেন। আসলে কী হয় জানেন ? আমি মনে মনে এখন এমন জায়গায় চলে যাই, পৃথিবীতে হয়তো তেমন কোনও জায়গাই নেই। বা হয়তো আছে, আমি জানি না। এবারে ভাবুন, এই রকম চিন্তা করতে করতে আমি হয়তো তখন দিল্লি যাচ্ছি। ভাবুন এবারে। আমি কি তাহলে সত্যি সত্যি গন্তব্যে পৌঁছলাম ?

-- বাহ্ ! তুমি তো বেশ ইন্টারেস্টিং !

-- আসলে ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমার বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা খুব কম। হয়তো, তাই কল্পনা করতেই ভালবাসি। ভাবনার তো আর ট্রেনে চড়তে টিকিট লাগে না ? বাই দ্য ওয়ে, ধারাবারি নামটা কিন্তু ভীষণ মিষ্টি।

-- নামটার একটা ইতিহাস আছে। শোনা কথা যদিও। এক সময় নাকি ওখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হত। কেন হত জানা যায়নি। ওই বৃষ্টিপাতের থেকেই ওইরকম নামকরণ।

-- গ্রামে যান না এখন ?

-- যাই তো। দেশে ফিরলেই যাই। শেকড়ের টান। গাছ যতই বড় হোক, শেকড় তাকে মাটিতে টানবেই। সেসব কী দিন ছিল যে ! তোমার এই রমনীদা তখন পাঠশালায় যেত। বৃষ্টি থৈ থৈ, জল, কাদা, পুকুর, নদী এক হয়ে ভাসাচ্ছে। তার মধ্যে ছপ্‌ছপ্ জল ভেঙে পড়তে যাচ্ছি। মশারি দিয়ে মাছ ধরছি। আমার এক প্রেমিকা ছিল জানো ? রোজ শরৎচন্দ্রের পার্বতীর মতো আমার জন্য মালা গেঁথে আনত। আহা ! ঠিক যেন

কাঁচামিঠে আমটি ছিল।

-- কে ?

-- মঞ্জুরী।

-- দেখা হয় এখন ওনার সঙ্গে ?

-- কি করে দেখা হবে ? তার তো সে কোন ছেলেবেলাতেই বিয়ে হয়ে গেছে। তখন গ্রামের মেয়েদের দশ-বারোতেই পার করে দিত। বিয়ের পর দু-চারবার দেখা হয়েছে। আমিও গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এলাম। কলেজে ভর্তি হলাম।গ্রামের পথে তখন থেকেই সম্পর্ক শিথিল হতে শুরু করল।

-- কষ্ট হয় না তার কথা মনে পড়লে ?

-- কষ্ট হবে কেন ? দেখো, আমি অত ইমোশনাল নই। মেয়েরা আমার কাছে একটা ঘোরের মতো। আসে আবার চলে যায়। বলতে পারো, স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে তো আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, যে কোনও সম্পর্কের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারি আমরা স্বপ্নের ভিতর। তাই না ? আর মেয়েরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, জবা। আমার বেঁচে থাকার রসদ বলতে পারো। মেয়েদের দেখলে কেমন খাদ্যের অনুভূতি হয় আমার। যেমন ধরো, কখনও মনে হয় কচি আম, পাকা জাম, সরস ডাব, অথবা ধরো কমলার কোয়া, বাতাবি লেবু এই ... এইরকম সব আর কী। হাসছেন রমনীমোহন। কাঁচা-পাকা চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন নিজের হাতে। চশমার ওপার থেকে চোখ নাচিয়ে বললেন, তোমাকেও কি দেখিনি ভেবেছ ? তোমাকেও দেখা হয়ে গেছে।

এতটুকু বিব্রত হল না জবা। বান্ধবীর বাড়িতেই রমনীমোহনের সঙ্গে আলাপ। বান্ধবীর শ্বশুরের বন্ধু। অতএব দাদা সম্বোধন করলেও পিতৃতুল্য লোক। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর তাছাড়া মানুষের চরিত্র তাকে আকর্ষণ করে। মনে মনে সে তাই স্থির

করে নিল। একটু স্টাডি করা যাক না। মনুষ্য চরিত্র বলে কথা।

-- কী ভাবছ ? লোকটা কেমন, না ?

-- কেন এরকম বললেন ? মনের ভাব গোপনেই রইল জবার। মনে ভাবল, 'চোখকে বলি দেখ, কানকে বলি শোন, মুখকে বলি চুপ।' অত:পর নিজের প্রসঙ্গ পাল্টালো জবা। জিজ্ঞেস করল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না ? রমনীমোহনের মুখের রং পরিবর্তন হল, চোখ এড়াল না জবার।

পরমুহূর্তেই হাসি মুখে রমনীমোহন বললেন, বাসন্তীর আবার পুজোর বাতিক। দেশে ফিরলে আজ কালিঘাট তো কাল দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় করে। আজও সকাল সকাল কোথায় যেন বেরলো। তা হবে এখন একদিন আলাপ।

-- আপনি যান না ? ভক্তি নেই বুঝি ঠাকুর-দেবতায় ?

-- টু বি ফ্র্যাঙ্ক, নেই। বলতে বলতে জবাকে অবাক করে দিয়ে রমনীমোহন বললেন, তোমার বয়েসটা কত ?

-- চৌত্রিশ। কেন ?

-- মাই গড। তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না গো। আমি তো ভেবেছিলাম পঁচিশ-টচিশ হবে। বাট আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট যে তোমার মধ্যে সাহস আছে। না হলে, যে মেয়ে একেবারে কচি ডাবের মতো নরম-সরস, সেই মেয়ে নিজের সত্যি বয়েস বলে ? তুমি ইচ্ছা করলে বাইশও বলতে পারো। কেউ অবিশ্বাস করবে না।

-- কী হবে ? বয়েস লুকিয়ে ?

হাসিটাই যেন রমনীমোহনের চরিত্র। আবার হাসলেন। বেশ প্রাণ খুলে। বললেন, কথা বলার সময়ে তোমার ঠোঁটে অপূর্ব একটা তিরতিরে কাঁপন লাগে। দেখেছ কখনও ?

কমলার কোয়ার মতো ঠোঁটে স্বচ্ছ মিষ্টি রসের কাঁপন। বাঃ বাঃ ! ভারি মিষ্টি। সব কথার উত্তর হয় না, জানে জবা। কিছু কথা বর্জ্য পদার্থের মতোই ফেলে দিতে হয়। এতটুকু উত্তেজিত বা অপ্রস্তুত না হয়ে সে হাসল, বলল, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন ?

লাফিয়ে উঠলেন রমনীমোহন, বললেন, সে এক টেরিবল এক্সপিরিয়েন্স। নিউজার্সি থেকে তার আগের দিনই মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি এসেছি নিউইয়র্কে। উফ্ ! ভয়ঙ্কর। বলতে বলতে চোখ বন্ধ করলেন রমনীমোহন। মুহূর্ত মাত্র। পরমুহূর্তেই বললেন, তুমি তো কবি-লেখক। তা কোনও লেখা আছে সঙ্গে ?

-- আছে। কবিতা।

-- পড়ো। শুনি।

রমনীমোহন তার দীর্ঘ ঋজু শরীরটা টানটান করে পা দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে বসলেন। জবা কবিতার খাতা বার করেছে পড়তে শুরু করল আগের দিন রাতে লেখা কবিতাটা। কবিতার দশম লাইন পড়া শেষ হতেই রমনীমোহন লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, ওই লাইনটা আবার পড়ো দেখি। জবা অবাক। পড়ছে সে, --

‘অন্যের কাম গন্ধ রক্ত থুতু, সফল অসফল বীর্যপাত
ঘাটতে ঘাটতে একদিন হঠাৎই সেই সে মেয়ে মুখ তুলে
আকাশের দিকে চাইল ...’

শেষ করার আগেই জবাকে থামিয়ে দিয়েছেন রমনীমোহন, বললেন, ব্যস্। হয়ে গেছে। আর দরকার নেই।

অবাক জবা। বলল, শুনবেন না পুরোটা ? পুরোটা না শুনলে কবিতার বোধটাই তো পাওয়া যাবে না।

আহ্ ! ধমক দিয়েছেন রমনীমোহন, তোমার কাছে থেকে এখন কবিতা শিখব ?

-- না না তা কেন ? সংযত হল জবা। আসলে আমি তা বলতে চাইনি ...

-- সে আমি জানি। আসলে কবিতার মূল ভাব আমার বোঝা হয়ে গেছে। কবিতার হাত তোমার ভাল। আর ওই যে লাইনটি, ওইটেই কবিতাকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। কোনও রকম অশ্লীলতা নেই অথচ প্রকৃত সত্যটা তুমি সুন্দরভাবে বলতে পেরেছ। তুমি খুব স্মার্ট মেয়ে বলতে লজ্জা নেই, আমি একটু শরীরী ধরনের। বললে, বিশ্বাস করবে না, আমাদের গ্রামে একটি জেনানা পুকুর ছিল। দুপুরবেলায় গ্রামের যত মেয়েরা স্নান করতে আসত সেখানে। আর আমি গাছে চড়ে, পাতার আড়ালে থেকে ওদের স্নান দেখতাম। মুহূর্ত দম নিলেন রমনীমোহন, বললেন, তোমার কি আমাকে খারাপ লাগছে ?

মাথা নেড়েছে জবা, উহুঁ। একটুও না। আপনি বলুন।

কথার খেই ধরে নিলেন রমনীমোহন, 'যা বলছিলাম, নারী শরীরটাই বুঝলে ধারুন থ্রিলিং, অ্যামেজিং একটা ব্যাপার। কম তো দেখলাম না এ জীবনে। মেমসাহেব থেকে গাঁয়ের মেয়ে, কচি শশা থেকে ঝুনো ডাব সবই দেখলাম, তবু অদ্যাবধি আকর্ষণ এতটুকু কমল না। যাক্, তোমার চিন্তাভাবনাগুলোও বেশ সাবলীল। ন্যাকা বোকা নয়।

অবাক জবা। এমন মানুষ সে জীবনে দেখেনি। মাত্র দু'দিনের আলাপে পিতৃতুল্য একটা লোক এইরকম কথা বলতে পারে। মনে মনে ভেবে দেখল জবা, খারাপ লাগছে কি ভদ্রলোককে আদৌ ? যদি লাগে, তাহলে কেন ? শুধু কি ওর এই খোলামেলা কথাবার্তার জন্য ? এটাকে উদারতা বলা যা না পারভার্সন ? উদারতাই যদি হয়, তবে উদারতার ডেফিনেশন কী ? যে কোনও বিষয়, তা যতই গোপনীয় হোক, তা নিয়ে সঙ্কোচহীন আলোচনা ?

রমনীমোহন বলে চলেছেন, আসলে কী জানো ? অনেকেই আমার মতো। নারী শরীর ভালবাসে। কিন্তু মুখে 'মা মা' করে। ছোঃ। ওগুলো আমার কাছে ভন্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। আমি ভাই খুব স্পষ্টবাদী মানুষ। বাই দ্য ওয়ে, তুমি একটু উঠে দাঁড়াও তো।

-- কেন ?

-- বলছি তো একটু উঠে দাঁড়াতে।

-- কেন বলবেন তো ? আশ্চর্য জবা।

-- তোমার কোমরের মাপটা দেখব।

-- দেখে ?

-- এই তোঃ। এইখানেই তোমরা বাঙালি মেয়েরা গেলে।

পরম আশ্চর্য জবা। মুখে বলল, আমার কোমরের মাপ খুব একটা অ্যাট্রাকটিভ নয়। লাভ নেই দেখে।

-- একথা তুমি বলতে পারলে ? রমনীমোহন ততোধিক আশ্চর্য।

-- না পারার কী আছে ? যা সত্যি তা সত্যিই।

রমনীমোহন এইবার চশমাটা খুলে হাতে নিলেন। কৌতুহল তার দু'চোখে উপছে পড়ছে। বললেন, ওয়েল, স্মার্ট এনাফ। প্রথম দিন তোমার সঙ্গে আলাপের পরেই বুঝেছিলাম, তুমি গড়পড়তা মেয়েদের মতো ঠিক নও।

হাসছে জবা। আশ্চর্য মানুষ একটা দেখা হচ্ছে বটে। ভালোই লাগে তার। কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ যে এ পৃথিবীতে আছে!

মুখে বলল, তাই বুঝি ?

-- তোমার নাম জবা কে রেখেছিলেন ?

আবার অবাক জবা। বলল, মানে ?

-- এত মানে মানে কর কেন ? নামটা কে রেখেছিলেন ? মুখে হাসি, অথচ মৃদু ধমক দিলেন রমনীমোহন।

-- জানি না। তবে আপনার নামটা কিন্তু বেশ। র-ম-নী-ম-ও-হো-ও-ন !

উচ্চগ্রামে হাসছেন রমনীমোহন। উদ্দাম হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন, তা বলেছ বটে বেশ। তবে তোমার নামটার মধ্যেও কিন্তু একটা যৌন গন্ধ আছে। তা জানো ?

হা হতোস্মি ! জবা স্থির।

রমনীমোহন বলে চলেছেন, মুখে তার মৃদু হাসিটি লেগেই রয়েছে -- আমরা তো বাংলা মিডিয়ামে লেখাপড়া করেছি, ওই যখন রিপ্রোডাকশন পড়ান হল -- জবা ফুলের পুংকেশর আর গর্ভকেশরের মিলন দিয়েই প্রথম নিষিদ্ধ গন্ধ পেলাম। জীবনের ওই প্রথম যৌন-পাঠ। তাতেই কী এক্সাইটমেন্ট আমাদের। তোমাকে দেখার পর থেকেই ওই জবা ফুলের কথা মনে পড়ছে। সাইকোলজিতে একে অনুষঙ্গ বা অ্যাসোসিয়েশন বলে।

-- গর্ভাধানের কথা মনে পড়ছে না ?

রমনীমোহন থমকে গেলেন যেন খানিকটা। জল খেলেন। চুরুট ধরালেন। তারপর

ঠোঁট উল্টে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ জবার দিকে। বললেন, বেশ সাহসী তো ?

হাসছে জবা, বলল, সাহসের তো কিছু করিনি ?

-- ভাল গুড। তোমার সঙ্গে কথা চালিয়ে আনন্দ আছে। তোমার প্রেমে পড়ে না কেউ ?

-- পরে হয়তো।

-- বলে না ?

-- সাহস পায় না হয়তো। সে সুযোগ তাদের দিই না হয়তো।

-- তুমি তো বেশ সুন্দরী। উষ্ণ। পুরুষ সঙ্গ পছন্দ করো না ? আমি মিন ... কী বলতে চাইছি ...

-- বুঝতে পারছি। ফিজিক্যাল রিলেশনের কথা বলছেন তো ?

-- রাইট।

-- রমনীদা, আমি একজন অত্যন্ত স্বাভাবিক চাহিদার স্বাভাবিক মেয়ে। দ্যাটস অল।

মাথা নাড়াচ্ছেন আপন মনে রমনীমোহন, বললেন, তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। অন্য যে কোনও মেয়ে হলে লজা পেয়ে যেত। আর আমার এক্সপিরিয়েন্স হল, ওই লজ্জা পেতে পেতে তারা আবার ভেতরে ভেতরে মুখর হয়ে উঠত। ওইটাই মেয়েদের রহস্য। ওই যে কথায় বলে না, 'দেখা দেয় না, ছোঁয়া দেয়, বাটি ভরে ছালন দেয় ?' ওই আর কী। নিজের রসিকতায় নিজেই সুখবোধ করলেন রমনীমোহন। মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি যে সবিশেষ ওয়াকিবহাল, এ বোধ তার সমস্ত

অভিব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ল যে, জবার দৃষ্টি এড়াল না। নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জবা, বলল, আপনি কিন্তু মেয়েদের মেধা বুদ্ধি বৃত্তি নিয়ে মন নিয়ে কিছুই বললেন না। কিছু ভাবলেন যেন রমনীমোহন। নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে জবার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মুখে খেলা করে যাচ্ছে অভিব্যক্তির বিভিন্ন রং। তারপর বললেন, ভাল প্রশ্ন। তা হলে অকপটে বলি, মেয়েদের বুদ্ধি থাকলে, তাদের আমার কেমন পুরুষ পুরুষ লাগে। মেয়েরা হবে নরম-সরম সুন্দরী।

-- কিন্তু আপনি যে বললেন, আমি বেশ বুদ্ধিমতি ? তাহলে ?

-- না গো। তোমার শরীরটাই যে কথা বলে। মুচকি হাসছেন রমনীমোহন। মুগ্ধতা তার দৃষ্টিময় ছড়িয়ে। বললেন, তাই তোমার মাথায় বুদ্ধি থাকলেও সেই বুদ্ধি তোমাকে কাঠিন্য দেয়নি। ভারি মিষ্টি মেয়ে তুমি। একেবারে শাঁসালো ডাব।

বেশ একটা চরিত্র দেখা হচ্ছে বটে। মনে মনে প্রস্তুত করল জবা নিজেকে। দেখাই যাক না কতদূর এগোয় লোকটা। বলল, আপনি কিন্তু এই বয়েসেও খুব স্মার্ট। আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে গর্ব করেন ?

-- মাথা খারাপ তোমার ! স্ত্রীরা এসব পছন্দ করে ?

-- কেন ?

-- বাসন্তী খুব ভাল স্ত্রী, সংসারের জন্য আইডিয়াল। আমি আবার একটু অন্য প্রকৃতির। তবে সংসারের জন্য বাসন্তীর মতো মেয়েরাই আদর্শ। তবে আমি জীবনটাকে অন্য চোখে দেখি। যেমন ধরো, আমার তোমাকে ভালো লেগেছে, এটা অকপটে বলতে পারি। সেটা কি মন্দ কথা ?

-- মোটেই না। লাগতেই পারে।

-- তোমার শরীরে আমি বহু যুগ বাদে আমার সেই গ্রামের গন্ধ পাচ্ছি। তোমার ছোট

হাতা, শার্টের ফাঁক দিয়ে তোমার বাহুমূল থেকে এই যে কচি কালো রোম উঁকি দিচ্ছে, ওগুলো দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? জামরুলের মাথায় কালো চুল। তারপর তোমার স্তন ? বেঁধে রেখেছ বটে, কিন্তু দেখলে মনে হচ্ছে, ছটপটে দুটো পায়রা। বাঁধন ছেড়ে উড়ে যেতে চাইছে।

মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়েছে জবার। তবু মুখের হাসি ফুটিয়ে রাখল, বলল, আর ?

-- কোমর তো বেতসলতা। তুমি জিনস্ পরেছ বলেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার ঊরু দুটোও কচি থোরের মতো। পশ্চাদ্‌দেশ একটু ভারি বটে, তবে ভাল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জবা, উপমা দিলেন না ?

হাসি যেন বাঁধ ভেঙেছে রমনীমোহনের। হাসছেন খুব, বললেন, ভালো মেয়ে তো ! পশ্চাদ্‌দেশ তোমার উল্টোনো তানপুরা ... ! কী ? ঠিক বলিনি ? ভুরু নাচালেন রমনীমোহন। আমার চোখ দেখেছ ?

-- অবশ্যই প্রশংসনীয়।

-- আরে বাবা, শরীর ছাড়া যে কিচ্ছু হয় না। পদাবলী পড়োনি ? রাধাকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে দেখনি ? নিষ্কাম প্রেম-টেম হল আসলে মনগড়া সোনার পাথর বাটি। যারা শরীরের কথা শুনে নাক কুঁচকোয়, জানবে তারা সব বেড়াল-তপস্বী। দেহবাদীরা বিশ্বাস করেন, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।' তারা বলেন, 'চন্দ্রসাধনে জন্মমরণ পর্যন্ত রোধ করা যায়। তারা শরীরের বর্জ্য পদার্থ পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে পান করেন। তাকে বলে চারিচন্দ্র সাধন।'

মনে মনে হাসল জবা। এ সবই তার জানা। তবু গভীর আগ্রহ ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইল রমনীমোহনের দিকে। রমনীমোহন বলে চললেন, 'চন্দ্রর কথা বললাম কেন জানো ?

দেহবাদীরা বিশ্বাস করেন, মানব শরীরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে। যথা --

‘সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তনু ওই
হাতে দশ, পায়ে দশ, গন্ড স্থলে দুই
অধরে ললাটে দুইটি অর্ধচন্দ্র তার উপর।’

এই চন্দ্রবহুল শরীর নিয়ে যখন নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত হয়, তখনই বলা হয় ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে।’ তাহলে বুঝতে পারছ শরীর সাধন বিনে জীবন মরু প্রায় ?

এক গেলাস জল খেয়ে উঠে পড়ল জবা। বলল, বেশ আড্ডা হল। জমে গেছিল সকালটা, কখন দুপুর হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন রমনীমোহনও, বললেন, আমার সঙ্গে আড্ডা মেরে কেউ বোর হয় না। তা, আবার দেখা হচ্ছে কবে ?

-- হয়ে যাবে। আপনি তো আছেন এখন। নিউজার্সিতে ফিরে যাচ্ছেন কবে ?

-- সামনের মাসে। বলতে বলতে কী যেন ভাবলেন রমনীমোহন। বললেন, কাল ফ্রি আছ ?

-- হুঁ, কেন ?

-- যাবে নাকি কাল কাছেপিঠে কোথাও ?

জবা মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, বলল, যাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু যাবেটা কোথায় ?

-- আরে ধূর। প্ল্যান করে যায় কেরানীরা। তোমার রমনীদা ওভাবে কোথাও যায় না।

কাল চলে এসো। তারপর দেখা যাবে।

নরম চোখে তাকিয়েছে জবা। দ্রবীভূত হলেন রমনীমোহন। মনে ভাবলেন, 'শতেক কথায় সতীও ভোলে !' যারপরনাই উৎফুল্ল তিনি। জবা চলে গেলে, ভেতরের ঘরে ঢুকে স্ত্রী বাসন্তীকে বললেন, আজ যে মেয়েটি এসেছিল ভারি স্মার্ট।

নিরুত্তর বাসন্তী। কুমড়ো ফুল চাল গুড়ি দিয়ে ভাজছিলেন। রমনীমোহন স্ত্রীর ঘাড়ে মুখ গুঁজে ঘাড়ের ঘ্রাণ নিলেন। বললেন, মেয়েদের অগ্রগতি হওয়া ভাল, বুঝেছ ? অর্ধেক মেয়ে নিজের শরীরই চিনল না ?

মাঝপথে তার কথা থামিয়ে দিয়েছেন বাসন্তী, বললেন, বয়েস হয়েছে। অনিয়ম এ বয়েসে পোষাবে না। স্নানে যাও।

মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন রমনীমোহন, জবাকে নিয়ে নদীর ধারে যাবেন। জলবিহার করবেন। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। সুগন্ধী সাবানে স্নান সেরে, বিদেশী সৌরভ শরীরে ছড়িয়ে নীল জিনসের উপর তপ্ত রক্তবর্ণের পাঞ্জাবী চাপালেন গায়ে। হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হচ্ছে তার। ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন। নটার সময় জবা আসবে। অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হচ্ছে যেন ক্রমশ।

অবশেষে ঘড়িতে নটার ঘন্টা পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে দরজায় পাখির ডাক 'পিক্ পিক্ পিক্ পিক্' শোনা গেল। ছুটে গেছেন রমনীমোহন। দরজা খুলে অবাক। দাঁড়িয়ে আছে এক বছর পনেরোর কিশোর। হাতে রঙিন কাগজে আচ্ছাদিত একটি পাত্র বিশেষ যেন। রমনীমোহন মহা বিরক্ত। বললেন, কাকে চাই ?

-- দিদি পাঠিয়েছেন।

বাসন্তীর উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ তিনি। কলকাতায় এলেই রাজ্যের শাকপাতা ফুল খাওয়ার ধূম পড়ে যায় তার। বিরক্তিকর। বললেন, তা কী ঘাসপাতা এনেছ আজ ? যাও, বৌদি ভেতরে আছেন, দিয়ে এসো গে।

-- খাম ? অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সেই কিশোর। বলল, আপনার জন্য পাঠিয়েছেন দিদি। ধরুন।

রমনীমোহন এবার যত না বিরক্ত হলেন, তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হলেন। কিশোরটির হাত থেকে রঙিন কাগজে আবৃত পাত্রটি নিয়ে তার মোড়কটি একটানে খুলে ফেলে, চরম বিস্ময়ে দেখলেন, পেতলের একটি সুদৃশ্য কুলোতে সুন্দর করে সাজানো আছে একটি বেতসলতা, দুটি কচি থোর, দুটি জামরুল, দুটি পাকা বেল এবং কমলালেবুর দুটি কোয়া ও একটি কড়ি।

হতচকিত রমনীমোহন প্রাথমিকভাবে কিছু বুঝতে পারলেন না যেন। বললেন, এসব ? এসব কী ? কে পাঠিয়েছে এসব ?

-- দিদি। একটা চিঠি আছে। পড়ে উত্তর দিতে বলেছেন। আমার হাতেই দিয়ে দেবেন।

রমনীমোহন কুলোতে রাখা চিঠিটি দ্রুত পড়তে শুরু করলেন।

শ্রদ্ধেয়,
দেহবাদ আপনি জানেন। আপনি সবিশেষ প্রাজ্ঞ। তবে চর্চার ক্ষেত্রটি বড়ই একমুখীন। পুরুষের পৌরুষ এবং অহঙ্কারে মদমত্ত হস্তির ন্যায় আপনার আচরণ। তাই বুঝি সদর্পে বলতে পারেন, যে মেয়ের বুদ্ধি থাকে, তাকে আপনার পুরুষ মনে হয়। হায় !

দেহবাদ নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশোনা আমারও আছে। জানি, কিভাবে কখন ও কেন এই বাদ বা তত্ত্বের উৎপত্তি। দেহবাদীরা মানুষকে ধর্মের অধিক উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। মন্দির-মসজিদ মোল্লাতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতি আস্থার প্রত্যয় ভেঙে দিতেই এই তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ, আপনি নিজে উপবীত ধারণ করেন।

মেয়েদের শরীর আপনার নিকট খাদ্যতুল্য। দু:খিত 'কবুতর' জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই পরিবর্তে পক্ক বিল্ব ফল পাঠালাম। যা স্তন সমতুল্য, পাঠালাম কড়ি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক। তানপুরা পাঠানো বড় ব্যয়সাপেক্ষ। বাদবাকি সব আপনার

চাহিদা মতো।

ইতি
জবা

রমনীমোহনের স্ত্রী বাসন্তী ভেতর ঘর থেকে বাইরে এসে কুলোতে সাজানো অত ফল দেখে আহ্লাদিত। বললেন, পুজো দিয়েছিলে নাকি তুমি ? কালে কালে কী হচ্ছে যে তোমার। দাও। আমাকে দাও। বাব্বা !

◆ সমাপ্ত ◆